পরিবেশবান্ধব সবুজ সার

কোন কোন বিশেষ ফসল চাষ করে তা নির্দিষ্ট বয়সে ভূমি উন্নয়নকল্পে চাষ দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিলে তাকে সবুজ সার বলা হয়। যে কোন সবুজ গাছকে কোমল অবস্থায় মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া, মাটির গুণাবলী উন্নয়নের জন্য একটি উত্তম কাজ বলে প্রাচীনকাল থেকেই স্বীকৃত হয়ে আসছে। মিশিয়ে দেয়ার পর মাটিতে অবস্থানরত অনুজীবের কার্যাবলীতে বিয়োজন ঘটে এবং এগুলো জৈব সারে পরিণত হয়। গাছের সবুজ পাতা, কচি শাখা-প্রশাখা সংগ্রহ ও জমিতে প্রয়োগ করে যে সার উৎপাদন করা হয় তাকে সবুজ পাতা সার বলে। জমির আশপাশ, পতিত জমি ও জঙ্গল থেকে পাতা ও শাখা সংগ্রহ করা যায়। জমিতে চাষ দিয়ে মিশিয়ে দেয়ার পর তার পচন প্রকৃতি ও পচন হারের উপর সবুজ সারের কার্যকরিতা নির্ভর করে। জমিতে মিশিয়ে দেয়ার পর সবুজ দ্রব্য পর্যায়ে কয়েকটি জৈব রাসায়নিক সার বিক্রিয়া সংঘটিত হয়। এসব বিক্রিয়ার পর সার থেকে খাদ্যোপাদান ধীরে ধীরে উদ্ভিদের জন্য প্রাপ্য হয়ে ওঠে। এজন্য অন্যান্য আয়তনী জৈব সারের চেয়ে সবুজ সারের কার্যকারিতা কিছুটা ধীরে বা বিলম্বিত হয়। সবুজ সারের পচনহার এবং মাধ্যমিক যৌগ উৎপাদন নিম্নলিখিত উপাদানের উপর নির্ভর করে।

উপস্থিত অণুজীবের প্রকার:

মাটিতে উপস্থিত অণুজীবের প্রকার ও কার্যপদ্ধতি যেমন ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের সংখ্যা, স্বভোজী ও অন্যভোজী অণুজীবের সংখ্যা, সবাত অণুজীবের সংখ্যা ইত্যাদি সবুজ পচন হার নির্ধারিত করে।

উত্তাপ:

সবুজ সারের পচনের জন্য ৩০ থেকে ৩৫ ডিগ্রি সে. তাপ সবচেয়ে ভাল। কম বা বেশি তাপে পচন হার কমে।

বায়ু চলাচল: মাটিতে বায়ু চলাচল পচন হার বাড়ায়।

সবুজ সারের জন্য মনোনীত গাছের বয়স বাড়ার সাথে সাথে সবুজ সারের মোট পরিমাণ এবং জমিতে পচনশীলতা বা পচন হারও ভিন্ন হয়। সবুজ গাছের বয়সভেদে এর রাসায়নিক গঠন ও উপাদানের পরিমাণে পার্থক্য হতে থাকে। এজন্য একটি নির্দিষ্ট বয়সের গাছ দিয়ে সার উৎপাদন করলে অধিক সুফল পাওয়া যায়। গাছের চারা বয়সে সহজে বিয়োজনযোগ্য নাইট্রোজেন পরিমাণে বেশি থাকে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে সেলুলোজ ও লিগিনিনেন পরিমাণ বেড়ে গেলে গাছ পচতে অসুবিধা হয় বা বিলম্ব হয়। মাটির কার্বন ও নাইট্রোজেন অনুপাত বেড়ে যায়। গাছের বয়স বাড়ার সাথে পেক্টোসান দ্রব্যের পরিমাণও বেড়ে যায়। অবশ্য গাছের বয়স খুব কম হলে সেখানে পানি ও পানিতে দ্রবণীয় দ্রব্য বেশি থাকে বলে সবুজ সার হিসেবে এর স্থায়িত্ব ও কার্যকারিতা কম হয়।

জমিতে সবুজ সার ব্যবহার করলে খুব উপকার পাওয়া যায়। যেমন :

১. মাটির উর্বরতা শক্তি বাড়ে

২. মাটির উৎপাদন বাড়ে

৩. মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বাড়ে

৪. মাটির ভৌত অবস্থার উন্নয়ন হয়, বিশেষ করে, মাটির সংযুক্তি উন্নয়ন সাধন

৫. মাটির আচ্ছাদিত রেখে ক্ষয় কমে

৬. মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়ে

৭. মাটিতে জীব ও অনুজীবের কার্যাবলী বাড়ে

৮. ফসল উৎপাদনের রাসায়নিক সারের কার্যকারিতা বাড়ে

৯. মাটি নরম রাখে।

যেকোন ফসল বা লতাপাতা সবুজ অবস্থায় মাটিতে মিশিয়ে দিলে তা থেকে সবুজ সারের কিছু না কিছু উপকারিতা পাওয়া যায়। কিন্তু কতকগুলো বিশেষ গুণাবলীসম্পন্ন ফসল বা গাছ দিয়ে সবুজ সার করলে অনেক বেশি উপকার পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের জলবায়ু ও মাটির উর্বরতার বিবেচনায় নিম্নলিখিত উদ্ভিদসমূহকে সবুজ ফসল হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। যথা : ধৈঞ্চা, গো-মটর, শন, বরবটি, সিম, আলফালফা, ক্লোভার, লুসার্ন প্রভৃতি। দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল কাউপি বা গো-মোটর দিয়ে সবুজ সার করার সম্ভবনা খুবই উজ্জ্বল। চট্টগ্রাম ও বরিশাল বিভাগে বিপুল পরিমাণ জমিতে গো-মটরের চাষ হয়।

যে সমস্ত জমি বেলেপ্রধান এবং জমিতে পানি জমার আশংকা নেই সেখানে সবুজ সার ফসল হিসেবে শন, পাট উপযোগী। এর শারীরিক বৃদ্ধ দ্রুত। মাটিতে এটি দ্রুত বিয়োজিত হয়। ধৈঞ্চা কিছুটা কষ্ট সহিষ্ণু উদ্ভিদ, এঁটেলজাতীয় মাটিতে ভাল জন্মে। ধৈঞ্চা কিছুটা খরা ও অপরদিকে জলবদ্ধতা সহ্য করতে পারে। বাংলাদেশে জলাবদ্ধ জমিতে সবুজ ফসল হিসেবে তুলনামূলকভাবে বেশি উপযোগী।

ধৈঞ্চা সবুজ সারকরণ ও বীজ উৎপাদন:

বাংলাদেশে সবুজ সার উৎপাদনের জন্য ধৈঞ্চা উপযুক্ত। তবে বেলেজাতীয় মাটির জন্য শন ভাল। বছরের যে কোন সময়ে মাটির জৌ অবস্থায় ঘন করে বীজ বুনে দিলে ৪০ থেকে ৫০ দিনের মধ্যে সবুজ সার উৎপাদন করা যায়। আমাদের দেশে বর্তমানে দুই ধরনের ধৈঞ্চা গাছ দেখা যায়। যথা-

১. সাধারণ ধৈঞ্চা,

২. আফ্রিকান ধৈঞ্চা।

মাটির প্রতিকূল অবস্থার কারণে মূল জমিতে বীজ বুনা সম্ভব না হলে অন্যত্র চারা তুলেও তা পরবর্তী সময়ে রোপণ করা যায়। বীজতলায় চারা উৎপাদনের জন্য প্রতিশতক জমিতে ৩০০ গ্রাম বীজ বুনতে হবে। বীজ থেকে চারা হলে তা সরাসরি লাগানো যায় আবার চারা একটু বড় হলে কাটিং করেও লাগানো যায়।

সবুজ সার উৎপাদনী ফসলের মধ্যে মাসকলাই ও মুগ কলাইয়ে নাইট্রোজেনের পরিমাণ ধৈঞ্চর চেয়ে কিছুটা বেশি, তবে ধৈঞ্চায় মোট সবুজ দ্রব্যের পরিমাণ বেশি। এসব গাছে ফসফেটের পরিমাণ প্রায় নাইট্রোজেনের সমান। পটাসের পরিমাণ ধৈঞ্চা গাছে একটু বেশি। আমাদের দেশে সবুজ সার হিসেবে ধৈঞ্চা গো-মটর ও শন-পাটের ব্যবহার অধিক লাভজনক। মাস কলাই ও মুগ কলাই সাধারণত সবুজ সার ফসল হিসেবে ব্যবহৃত হয় না। তবে ফসল হিসেবে চাষ করলে আংশিক উপকার হয়।

সবুজ ফসল হিসেবে ধৈঞ্চা গাছের একটি বিশেষ সুবিধা হচ্ছে এটি জলাবদ্ধ এবং অনুর্বর জামিতেও জন্মে। ধৈঞ্চার বীজ উৎপাদন হারও বেশি। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে গো-মটর, মুগ, মাসকলাই, সয়াবিন বরবটি ইত্যাদি। সবুজ সার ফলস হিসেবে ব্যবহার না করলেও তা পরিপক্ক হওয়ার পর মাটির উপরের অংশ কাচি দিয়ে কেটে নিলে নডিউল ও শিকড় মাটিতে থেকে গিয়ে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে।

লেখক: প্রফেসর ড. মো: সদরুল আমিন

তথ্য সূত্র: দৈনিক ইত্তেফাক

লজ্জাবতীর জৈব সার

বেশির ভাগ মানুষের কাছে লজ্জাবতীগাছ কাঁটাওয়ালা আগাছা হিসেবে পরিচিত। কবিরাজ ছাড়া আর কারো কাছে তার কোনো দাম নেই। যেখানে সেখানে জন্মে চাষিদের বড্ড ঝামেলায় ফেলে। সাফ করতে খুব কষ্ট হয়। আর একবার কোথাও জন্মালে সহজে মরতে চায় না। অথচ এই লজ্জাবতী গাছকেই কাজে লাগিয়ে এখন জৈব সার তৈরি করা হচ্ছে। এই জৈব সার ফসলের জমিতে ব্যবহার করে ভালো ফসলও পাওয়া যাচ্ছে। বিদেশে ভুট্টা ও বাজরার জমিতে এই জৈব সার ব্যবহার করে ভালো ফলন পাওয়া গেছে অনেক আগেই। সম্প্রতি আমাদের দেশেও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর লজ্জাবতীর জৈব সার তৈরি ও ব্যবহারের ওপর জোর দিয়ে তা চাষিদের মধ্যে সম্প্রসারণের চেষ্টা চালাচ্ছে। তবে বলে রাখি, যে লজ্জাবতীগাছ থেকে জৈবসার তৈরি করা হয় সেটি কিন্তু মোটেই আমাদের দেশীয় লজ্জাবতীর গাছ নয়, থাই লজ্জাবতী। দেশীয় লজ্জাবতীগাছ কাঁটাওয়ালা, ছোট, কাণ্ড তুলনামূলকভাবে শক্ত, বৃদ্ধি কম। তাই এই গাছ দিয়ে জৈব সার তৈরি করা বেশ ঝামেলার এবং বায়োমাস কম বলে কম জৈব পদার্থ পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে বিদেশী তথা থাই লজ্জাবতী গাছে কোনো কাঁটা নেই বলে নাড়াচাড়া করতে খুব সুবিধে। এসব গাছ তাই আমাদের দেশে কাঁটাবিহীন লজ্জাবতী নামে পরিচিত। এই লজ্জাবতীগাছ দ্রুত বাড়ে, গাছ প্রায় ৩ থেকে ১০ ফুট লম্বা হয়। এ জন্য প্রচুর বায়োমাস পাওয়া যায়। গাছ নরম ও রসালো বলে দ্রুত পচে যায়। এ কারণে লজ্জাবতীগাছ থেকে অল্প সময়ের মধ্যেই বেশি জৈব সার পাওয়া যায়। এই জৈবসারে গাছের পুষ্টিও কম থাকে না। ২.০৩-২.৬ ভাগ নাইট্রোজেন, ০.১৭৫-০.২৩ ভাগ ফসফরাস এবং ১.২৩৭-১.৭৪১ ভাগ পটাশিয়াম আছে। তাই অন্যান্য শিমজাতীয় গাছের মতো লজ্জাবতীগাছ থেকেও পুষ্টি পাওয়া যায়। এ জন্য এটা হতে পারে আগামী দিনে জৈব সারের একটি উত্তম উৎস। বিশেষ করে যেসব জমিতে সবুজ সার হিসেবে ধৈঞ্চা ব্যবহৃত হয় সেখানে ধৈঞ্চার বদলে লজ্জাবতীগাছও সবুজ সার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। তা ছাড়া বাণিজ্যিক আমবাগানে চাষ দিয়ে লজ্জাবতীর বীজ বুনে দিলে সেসব বাগানের জমিকে লজ্জাবতীগাছ ঢেকে ফেলতে পারে। ফলে আমবাগানে আর আগাছা জন্মাতে পারে না এবং লজ্জাবতী গাছের শিকড়ে জন্মানো লালচে রঙের নডিউল বা গুটি বাতাস থেকে নাইট্রোজেন সঞ্চয় করে আমবাগানের মাটিতে সরবরাহ করে উর্বরতা বৃদ্ধি করে। থাইল্যান্ডে ভুট্টার জমিতে এভাবে লজ্জাবতীগাছ ব্যবহার করে ভুট্টার জমির আগাছা নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং মাটির উর্বরতা ঠিক রাখা হয়। দিন দিন যেভাবে সারের দাম বাড়ছে তাতে চাষি ভাইয়েরা এখন অনেকেই আগের মতো জমিতে সার ব্যবহার করতে আগ্রহী হচ্ছেন না। ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে জমিতে সারের ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। সেজন্য এ ধরনের জৈব সার তাদের উপকার করতে পারে। লজ্জাবতী গাছের একটা বড় সুবিধা হলো যেকোনো প্রতিকূল পরিবেশেও সে জন্মাতে পারে। তাছাড়া কোনো রোগপোকাও ধরে না বা কোনো বালাইয়ের বিকল্প পোষক হিসেবে কাজ করে না।

এ দেশে বোরো ধান কাটার পর মার্চ-এপ্রিল মাসে প্রথম পশলা বৃষ্টির পর ধানের জমিতে একটা চাষ দিয়ে লজ্জাবতীর বীজ ছিটিয়ে বুনে দেয়া যায়। বীজ গজানোর পর বৃষ্টি পেয়ে গাছ দ্রুত বাড়তে থাকে এবং জমিকে ঢেকে ফেলে। ফুল বা কুঁড়ি আসার আগ পর্যন্ত যেকোনো সময় এসব নরম সবুজ গাছ কুচি কুচি করে কেটে জমিতে চাষ দিয়ে মিশিয়ে দেয়া যায়। বোরো ধান কাটার পর যেসব জমি কিছু দিন খালি পড়ে থাকে সেসব জমিতে এভাবে লজ্জাবতীর সবুজ সার তৈরি করা যায়। রোপা আমনের চারা রোপণের ১০ থেকে ১৫ দিন আগে অর্থাৎ জুন-জুলাই মাসে জমির সাথে চাষ দিয়ে এভাবে মিশিয়ে দেয়া যেতে পারে। তবে আগের মৌসুমে চাষের জন্য বীজ দরকার। সে বীজের জন্য আলাদা একটা জায়গায় বর্ষাকাল শেষ হওয়ার পরপরই বীজ বুনে দিতে হবে। সেসব গাছে অক্টোবরে ফুল আসবে এবং ধীরে ধীরে সেসব ফুল থেকে ফল ও বীজ হবে। জানুয়ারিতে গিয়ে সেই বীজ সংগ্রহ করে রেখে পরের মৌসুমে বুনতে হবে। লজ্জাবতী গাছের বীজ সংগ্রহ করে সাথে সাথে বুনলে খুব কম গজায়। কেননা বীজের সুপ্তাবস্থা আছে। সুপ্তকাল ভাঙার জন্য বীজ বোনার আগে হালকা গরম পানিতে বীজ ভিজিয়ে নিলে ভালো গজায়। সাধারণত ফেব্রুয়ারি থেকে জুন মাসের মধ্যে বীজ বুনলে ভালো গজায়। তাই বর্ষাকালের আগে লজ্জাবতীর চাষ করতে হবে সবুজ সারের জন্য এবং বর্ষার পরে চাষ করতে হবে বীজের জন্য। গাজীপুরের সার্ডিতে কাঁটাবিহীন লজ্জাবতীকে এ পদ্ধতিতে চাষ করে সফলতা পাওয়া গেছে এবং বীজ উৎপাদন করে তা বিভিন্ন জেলায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে বলে প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক রবীন্দ্র কুমার মজুমদার জানান। এমনকি তিনি বর্ধনশীল লজ্জাবতীর গাছ কেটে কচুরিপানার মতো স্তূপ করে পচিয়ে জৈবসার তৈরি করতেও সক্ষম হন। এই সার অন্যান্য জৈব সারের মতো সবজি ক্ষেতেও ব্যবহার করা যায়। থাইল্যান্ডে এক পরীক্ষায় দেখা গেছে, প্রতি হেক্টর জমি থেকে লজ্জাবতীগাছ প্রায় ৩.০ থেকে ৩.৫ মেট্রিক টন শুষ্ক জৈব পদার্থ উৎপাদন করে। এ পরিমাণ বায়োমাস শুষ্ক জৈব পদার্থ থেকে ৬১ থেকে ৭২ কেজি নাইট্রোজেন/হে, ৫ থেকে ৬ কেজি ফসফরাস/হে এবং ৩৭ থেকে ৪৪ কেজি পটাশিয়াম/হে পুষ্টি উপাদান পাওয়া সম্ভব যা আমাদের রাসায়নিক সারের চাহিদা অনেকাংশে পূরণ করতে পারে।

লেখক: মৃত্যুঞ্জয় রায়

তথ্যসূত্র: দৈনিক নয়াদিগন্ত